Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501061 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

The History of a Shaivite pilgrimage site in South 24 Parganas
দক্ষিণ ২৪ পরগনার একটি শৈব তীর্থের ইতিকথা

Debasish Mondal
Teacher

Received on: 30th April 2026
Accepted on: 16th May 2026

Abstract:
The pace of life in a diverse world is very diverse. How many accidents, how many disasters, how many colours and jokes are there at every turn. People build a world with so much hope, the creator of man with extreme cruelty breaks that world dream and shatters it to pieces. Who has ever been able to unravel the essence of his creation-mystery. If we weigh the desires of man, the needs of man, the love of man, all these calls in one equation, the calculation becomes very wrong. That is why the climax of the joke - on the one hand, he gives a lot of money, on the other hand, he makes him bankrupt. He gives a flower a fragrance, and at the same time gives thorns, and on the other hand, he presses a pile of stones on the chest of the one who gives sixteen annas. The whimsical god is a game of whims. Otherwise, why don't we get what we want? God is very cruel. He gives with one hand, and takes with the other. Yet He is the most merciful. Thinking about this, if you calculate His giving and taking, you will definitely get something to be satisfied with. This is the world – this is what people have to live with. The flow of life in the ocean of world is endless. It has no decay, no end. Life is an enemy – it will attack whenever it gets the opportunity. Its uninterrupted flow cannot be stopped for any reason – it will not go away. Again, human life is like a riverbank – at every moment he has to endure so much misery, so much misery, so much lamentation, so much sighing, so much aging, so much death, so much sorrow, so much repentance. He has to suffer so much sorrow. He has to live with this – yet this world is the 'meeting place' of this life. 'Ommo Bhagavate Vasudeva' O Vasudeva's son Shri Krishna, O all-pervading Supreme Lord, I offer my respectful obeisances to You.

Key Words:
Sri Krishna, Shiva, Kachari, Baidyanath, Badyanath, Geeta, Jyotirlinga, South 24 Parganas, Baruipur

মূল প্রবন্ধ

শ্রীকৃষ্ণে বৈষ্ণবানান্ত প্রেমভক্তি বিবন্ধতে।
কৃষ্ণ ভক্তি রসাসার বর্ষিরুদ্রানু কম্পয়া।।

বৈষ্ণব হয়ে শিবরাত্রি ব্রত করলে হরিভক্তি রসের সারধর্মী শঙ্করের প্রসাদে 'শ্রী হরির প্রতি' প্রেমভক্তি বর্দ্ধিত হয়। অর্থাৎ 'হরি ও হরের' মহামিলন হয়। বলা হয় দেবাদিদেব মহেশ্বর 'বিল্বপত্রে সন্তুষ্ট'। তারও ব্যাখ্যা রয়েছে 'যোগিনীতন্ত্রে'। বলা হয়েছে বিল্বপত্র

© Santiniketan Sahityapath

(বেলপাতা) দলের তিনটি দলের মধ্যে উর্ধ্বপত্র বা মধ্যে হলেন দেবাদিদেব মহাদেব, বামপত্রে প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং দক্ষিণ পত্রে শ্রীবিষ্ণু অবস্থান করেন। তিনটি দলের ত্রি-দেবের যে তিনটি মূল শক্তি 'দুর্গা', 'লক্ষী' ও ' সরস্বতী' বিরাজিতা হন সেখানে।

দ্বাদশজ্যোর্তিলিঙ্গের অবস্থান

শিবপুরাণ ও নন্দীপুরাণে দেবাদিদেব শিব বলেছেন, 'আমি সর্বত্র বিদ্যমান'। সহস্র সহস্র জ্বালা-মালা-সংকুল কালানল সন্নিত 'জ্যোর্তিলিঙ্গের' কথা বলা হয়েছে যা অব্যয়-অক্ষয়-অতুলনীয় এবং যার আদি-মধ্য-অন্ত নেই। সেই জ্যোর্তিলিঙ্গের অবস্থান সম্বন্ধে বলা হয়েছে —

সৌরাষ্ট্রে 'সোমনাথঞ্চ' শ্রী শৈলে 'মল্লিকার্জুনম'।
উজ্জয়িন্যাং 'মহাকালম্' 'ওঙ্কারম্' মল্লেশ্বরম্।।
পয়ল্যাং 'বৈদ্যনাথঞ্চ' ডাকিন্যাং 'ভীমশঙ্করম্'।
সেতুবন্ধে তু 'রামেশাং' 'নাগেশং' দারুকাবনে।।
বারনস্যাং তু 'বিশ্বেশং' 'এ্যম্বকং' গৌতমীতটে।
হিমালয়ে তু 'কেদারং' 'ঘুসূনেশং' শিবালয়ে।।
এতানি জ্যোর্তিলিঙ্গানি সায়ং প্রাতঃ পঠেন্নরঃ।
সপ্তজন্ম কৃতপাপং স্মরণেন বিনশ্যতি।।

অর্থাৎ এই বারোটি স্থানে আমি 'দ্বাদশ জ্যোর্তিলিঙ্গাকারে' অবস্থান করি। যার অর্থ হলো এই স্থানগুলিতে আমি 'স্বয়ম্ভু-শিব' হিসেবে অবস্থান করি যা কোনো ভাবেই স্থাপিত নয় 'স্বয়ম্ভু' অর্থাৎ 'সহজাত সৃষ্টি'। প্রকৃতিতে যা আপনা থেকেই স্থিত ও প্রকীর্ত্তিত। কোথায়? কি রূপে?

১। গুজরাটে (সৌরাষ্ট্রে)	:	শ্রী সোমনাথ রূপে
২। কৃষ্ণা নদীর তটে (শ্রী শৈল্যে)	:	শ্রী মল্লিকার্জুন রূপে
৩। উজ্জয়িনীতে	:	শ্রী মহাকাল রূপে
৪। নর্মদা তীরে মল্লেশ্বরে	:	শ্রী ওঁঙ্কারনাথ রূপে
৫। হিমালয়ের কেদারনাথে	:	শ্রী কেদার লিঙ্গা রূপে
৬। পয়ল্যা অর্থাৎ দেওঘরে	:	শ্রী বৈদ্যনাথ রূপে
৭। দক্ষিণ ভারতের রাজামুণ্ডিতে	:	শ্রী ভীমশঙ্কর রূপে
৮। সেতুবন্ধ	:	শ্রী রামেশ্বর লিঙ্গা রূপে
৯। দারুকাবনে	:	শ্রী নাগেশ্বর রূপে
১০। বারানসী (কাশীতে)	:	শ্রী বিশ্বেশ্বর বা শ্রীবিশ্বনাথ রূপে
১১। গৌতমী অর্থাৎ গোদাবরী তীরে	:	শ্রী এম্বক লিঙ্গা রূপে
১২। শিবালয়ে	:	শ্রী ঘুশ্মেশ্বর লিঙ্গা রূপে

কি বলা হয়েছে?

প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় যদি এই 'দ্বাদশ লিঙ্গের' স্মরণ করা যায়-তাহলে 'সাতজন্ম কৃত' সমস্ত পাপ বিনষ্ট ও দূরীভূত হয়।

শাস্ত্রের উল্লেখে এও উল্লেখযোগ্য —

'শিবলিঙ্গা' অর্থাৎ প্রতিটি 'জ্যোর্তিলিঙ্গাই' কিন্তু 'উত্তরমুখী'।

কেন উত্তরমুখী? উত্তরদিক হলো 'সংহারের দিক'। প্রলয়ের অধিকর্তা হলেন — 'শিব'। তাই তিনি 'উত্তরমুখী'। তাই ওই স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গের অনুকরণে বা জ্যোর্তিলিঙ্গের দৃষ্টান্ত অনুসরণে সমস্ত স্থাপিত শিবলিঙ্গাকে 'উত্তরমুখী' করেই স্থাপন করা হয় প্রলয় বা ধংসের হাত থেকে বাঁচার জন্যে।

© Santiniketan Sahityapath

প্রার্থনা করা হয় —

"হে দেবাদিদেব মঙ্গালময় শিব, আমাদের প্রতি দয়া করে, করুণা করে ঐ উত্তর দিকেই তুমি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখো যাতে আমরা সমস্ত প্রলয়ের হাত থেকে ধংসের হাত থেকে রক্ষা পাই।"

আরো লক্ষণীয়

শিবলিঙ্গের সঙ্গে 'সহজাত-সংযুক্ত' সমস্ত 'যোনীমুখের' অবস্থান

ঈশৎ ঈশান বা উত্তর-পূর্ব কোণাভিমুখী।

উক্ত দ্বাদশ জ্যোর্তিলিঙ্গ যেমন ভারতবর্ষের দ্বাদশ স্থানে স্বমহিমায় ভাস্বর, সারা পশ্চিমবঙ্গেও বেশ কিছু শিবস্থান তেমনি সমান ভাস্বর আপন স্বাতন্ত্র্যে যার মধ্যে তারকেশ্বরের 'বাবা তারকনাথ' অন্যতম রাজ্যের গণ্ডি পার হয়েও যার খ্যাতি সর্বজন বিদিত। মনস্কামনাপুরণের নিমিত্ত শ্রাবণ মাসে বাঁকে জল নিয়ে বাবা তারকনাথের কাছে যাওয়া তো এখন একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে।

গ্রাম বাংলার শিব ঠাকুর

শুধু বাবা তারকনাথ কেন, গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত স্থানে স্থানে কোথাও 'জলেশ্বর' কোথাও 'নাগেশ্বর', কোথাও 'জটিলেশ্বর' বা আরো ভিন্ন ভিন্ন নামে বহু শিবস্থান বা শিব মন্দির স্বমহিমায় বিরাজ করছে। রাঢ় দক্ষিণবঙ্গে বা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়ও তেমনি 'জটার-দেউল', 'মন্দিরের বাজার', 'জয়রামপুর', 'চিত্তশালী', 'বানচাপড়া', 'বাবা বড় কাছারি', 'বাবা ছোট কাছারি' প্রভৃতি স্থানগুলি 'শিবক্ষেত্র' হিসাবে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে।

স্থান

তেমনি বারুইপুর থানায়, বর্তমানে বারুইপুর-পশ্চিম বিধানসভার অধীনে শিখরবালী ২ নম্বর গ্রামপঞ্চায়েতের কুন্দরালী গ্রামের প্রত্যন্ত সীমায় শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায়, কল্যাণপুর স্টেশন সন্নিকটে 'বাবা শিব কাছারী বৈদ্যনাথের অধিষ্ঠান' আপামর ভক্ত সাধারণের মনে যথেষ্ট ভক্তির শ্রদ্ধার উন্মেষ ঘটায়। চিরাচরিত শিবস্থান হিসাবে বর্তমানে যা স্বাতন্ত্রের সর্ব্বোচ্চ্য শিখরে অধিষ্ঠিত। বৎসরের প্রতিটি শনি-মঙ্গাল বারে হাজার হাজার পুণ্যার্থী-ভক্ত জনসাধারণ পূজা ও 'মানসিক ছলম্' নিয়ে উপস্থিত হন শ্রী শ্রী বাবা বৈদ্যনাথ শিব কাছারিতে তাঁদের মনস্কামনা পূরণার্থে।

গাজন-উৎসব বা চৈত্র-সংক্রান্তিতে এখানে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয় মেলা উপলক্ষে। বিরাট জায়গা জুড়ে মেলা বসে। বিভিন্ন দোকান পসারিতে ছেয়ে যায় চারিদিক। বহুদূর দূরান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা এসে জড়ো হন শ্রী শ্রী বাবা বৈদ্যনাথের কাছে সন্ন্যাস ও নীলপূজাতে শ্রী শ্রী বাবার মাথায় গঙ্গা জল ডাবের জল ও দুধ দিয়ে স্নান করাতে ও পূজা চড়াতে। শ্রী মণ্ডিত 'বুড়ো-বটের' পবিত্র বেদী-দুলে ধূপ-বাতি প্রদীপ জ্বালাতে। মুখরিত হয়ে ওঠে চারদিক। দিকে দিকে ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে গমগম করতে থাকে —

'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ বাবা বিদ্যনাথের চরণে সেবা লাগে, বাবা শিব কাছারীর
চরণেসেবা লাগে ব্যোম্, ত্রিশূলধারী শিবের চরণে সেবা লাগে' ব্যোম্।
'বাবার হাতে ত্রিশূল মাথার জটা বাবা আমার পাগলা বেটা,
ভোলেবাবা ভোলেবাবা পার করেঙ্গা
বাবার __ টেলিফোন।।'

মেলা উপলক্ষে পুতুল-নাচ, পালা-গান ও যাত্রাগানের আসরও বসে। মেলারসুষ্ঠ পরিচালনা, পুণ্যার্থী ভক্তমণ্ডীলী ও সুধী-ভক্তসাধারণের ইতার্থে এবং দূরদূরান্ত থেকে আগত 'সন্ন্যাসীদের সেবাপূজা' ও 'দন্ডী পরিক্রমার' জন্য সুশৃঙ্খল সেচ্ছাসেবকরাও প্রাণপাত করে থাকেন। এমনকি আগত পুণ্যার্থীদের নূন্যতম পরিসেবার স্বার্থেসংশ্লিষ্ট গ্রামপঞ্চায়েত সদস্যও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

প্রদীপ জ্বললে তার আলোতে যেমন তার চারপাশের অন্ধকার দূরীভূত হয়, তার প্রজ্জ্বলিত শিখার তাপ-উত্তাপে সবাই স্নিগ্ধ হন। পবিত্র হন কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রদীপ-জ্বালানোর জন্যে তার 'সলতে-পাকানোর' একটা ভূমিকা থাকেই। ভূমিকা থাকে প্রজ্বলিত

© Santiniketan Sahityapath

শিখাকে দমকা হাওয়া ও ঝড় ঝাপটার হাত থেকে বাঁচানোর তার পরেতো তার তাপ-উত্তাপের প্রশ্ন। শ্রী শ্রী বাবা বৈদ্যনাথ শিব কাছারীর প্রকটিত হওয়ারও একটা প্রত্যুজ্জ্বল ইতিহাস আছে যা শুধু বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভক্তিনম্র বিশ্বাসের নিক্তিতেই মাপা সম্ভব। সাধারণ বোধবুদ্ধিতে তা সত্যসত্যই অগম্য যা শুধু ইতিহাস নয়-সময়ের পারম্পর্যে বিন্দুতে সিন্ধু হওয়ার ইতিহাস।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন —

মূঢ়লোকে না বিচরে কিভাবে কি হয়।
উৎপত্তি, স্থিতি ভোগ কার বা কোথায়।। (১৫/১০)

ঠিক তাই! কার কোথায় উৎপত্তি? কি থেকে কিসের উৎপত্তি? কিভাবে উৎপত্তি? কেনই বা উৎপত্তি? সর্বোপরি তার স্থিতিই বা কি ভাবে এবং কাথায়? এইসব প্রশ্নের উত্তর তো সাধারণ মানুষের জানার কথা নয়। জানা সম্ভবও নয়। সম্ভব নয় এইসব নিগূঢ়-তত্ত্বের অর্থ উদ্‌ঘাটন করা। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের 'জ্ঞানচক্ষু' উম্মেলিত করে বলেছিলেন —

আমি যারে আলো দিই সে আলো পায়।
আমার আলোতে সে বিকশিত হয়।। (১৫/১২)

সুতরাং সেই আলো যখন কোনো ভাগ্যবানের উপর বর্ষিত হয় তখন সম্ভব-অসম্ভব বলে কিছু থাকে কি তার জীবনে? শতাধিক বৎসর পূর্বে এমনই এক কৃতার্থ শুদ্ধ আধার সদৃশ সাধক-শ্রেষ্ঠের আবির্ভাব ঘটেছিল এই 'শিবপীঠে'। প্রেক্ষাপটের বিচারে এই স্থানটি তখন জনাকীর্ণ তো নয়ই বরং প্রত্যন্ত জঙ্গালাকীর্ণ অনাবাদী জমির প্রান্তসীমা বলেই চিহ্নিত হতো। নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে লোকজনের খুব বেশী যাতায়াত ছিল না এখানে। তবে বর্তমান এই প্রাচীন বটগাছটির অস্তিত্ব তখনো ছিল, তবে তা ছিল বয়সে নবীন। কৈশোর থেকে যৌবনে আসীন মাত্র।

জনশ্রুতি, এমনি এক সময়কালে একদা এক সৌম্যদর্শন মৌনপ্রায় সাধককে প্রত্যক্ষ করলেন কেউ কেউ সেখানে। খবর রটতে সময় লাগলো না। সীমিত লোকের দৃষ্টিতে যা ছিল সীমাবদ্ধ, বিস্ময় ও কৌতূহলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তা হয়ে উঠলো জনাকীর্ণ। সকলের চোখে মুখে বিস্ময়কে এই সৌম্য-ব্যক্তিত্ব পঞ্চাশোর্ধ সাধক? কি এর পরিচয়? কোথা থেকে এলেন ইনি? প্রশ্ন, প্রশ্ন আর প্রশ্ন, তবে সবই নিরুচ্চারে, নিভৃত আলাপচারিতায়। মৌন-মুখরতা দিয়ে কেউই তাঁর মৌনতা ভাঙতে চাইলেন না। সাধক প্রবরও যেন স্থিতধি, নিজের মধ্যে আত্মস্থ। আত্মস্থ আপন স্বাতন্ত্র্যে। সঙ্গে খাবারদাবার কিছু আছে বলে তো মনে হয় না। কোনো লোটা-কম্বলও না। যেন কোনো এক দিব্য পুরুষ। কেউ কেউ সামান্য কিছু ফলমূল ও দিয়ে যেতে লাগলেন তাঁকে সেবা পূজার জন্যে। শুরুটা আকস্মিক হলেও ওঁর বিনম্র ব্যবহার, তাত্ত্বিক-বিচার বোধ, মানবিক পেলবতা, সর্বোপরি মৌনতার অন্তরালেও মৌন-মুখর ও জনহিতৈষী একটা মানুষকে আবিষ্কার করল সবাই। তাতে তাঁকে আপনজন বলে না ভাবার আর কারণ খুঁজে পেল না কেউই। অচিরাৎ ভক্ত সমাগমে নতুন মাত্রা আরোপিত হতে লাগলো ওই স্থানটি। 'শিবকথা' ও 'শিবগাথা' শোনার আগ্রহে অধীর অপেক্ষা নিয়ে বসে থাকতেন সবাই। সদাহাস্য স্মিতবাক সাধকশ্রেষ্ঠ কাউকেই বৈমুখ করতেন না। দেখতে দেখতে জনমানসে স্থানটি অল্প-বিস্তর রেখাপাত করতে লাগলো 'শিব ঠাকুরের থান' হিসাবে।

দিন-মাস-বছর কাটতে লাগলো। ভক্ত-প্রাণ কেউ কেউ আবার ওঁর সান্নিধ্য লাভেও ধন্য হতে লাগলেন। নিকটবর্তী সোনাগাছী গ্রামের বধিষ্ণু মণ্ডল পরিবারের বংশানুক্রমিক সাধন মার্গের উত্তর-কালীসাধক রামচন্দ্র মণ্ডল, অরুণচাঁদ মণ্ডল তথা রাধানাথ মণ্ডলের কনিষ্ঠ পুত্র তথা যোগ্য উত্তর-সাধক 'যোগীন' হলেন তেমনি এক ভক্ত যাঁর পোষাকী নাম যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। ঈশ্বর কখন কাকে কীভাবে কৃপা করবেন তা কি কেউ বলতে পারে? পথের দুপাশে আদরে বা অনাদরে বহু ফুল ফোটে। কিন্তু কটা ফুল দেবতার পূজাতে লাগে? আবার তারমধ্যে কটা ফুল তার পায়ে নিবেদিত হয়? হয়না। সব ফুল সেই ভাগ্য নিয়ে ফোটে না। ভগবান তো গীতাতেই বলেছেন —

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিমাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।।

© Santiniketan Sahityapath

'সহস্র মানুষের মধ্যে কোন একজন। সিদ্ধিলাভ করিবারে করয়ে যতন।। তার মধ্যে কেহ কেহ আমাকে তত্ত্বত বুঝিতে সমর্থ হয় বিবেকবশতঃ।।'

তেমনি বিবেকের তাড়নায় শ্রদ্ধাবনত চিত্তে সোনাগাছী গ্রামের সেই ভাবুক আত্মভোলা, 'যোগীন' আর পাঁচজনের মতো একদিন এসে 'নাড়া' বাঁধলেন ওই বর্ষিয়ান সাধকশ্রেষ্ঠর কাছে। তত্ত্ব ও সম্যক জ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট উপায়ই হলো — সৎগুরুতে আত্মনিবেদন। তবে চেনার চোখ চাই। চিনতে হবে। জানতে হবে, তবেই না সম্যক জ্ঞানার্জন। প্রকৃত জহুরীর 'জহর' চিনতে কখনো ভুল হয় না। তাই ওই সাধক-শ্রেষ্ঠ তাঁর জহুরীর চোখ দিয়ে 'যোগিনী'কে চিনতে ভুল করলেন না। যোগীনও মুগ্ধ হলেন। বিমোহিত হলেন। যুগ যুগ ধরে মানুষ ছুটে চলেছে যে স্রষ্টার সন্ধানে। এতদিনে সন্ধান মিলেছে তাঁর নিজের হৃদয় প্রাঙ্গনে।। তাই জ্ঞানানন্দে বিহ্বল, বিভোর যোগীন — 'গুরুপদ' আঁকড়েই পড়ে রইলেন সেখানে 'গুরুচরণ' স্মরণ করে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটান তিনি।

'গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তজনে।।' (কৃষ্ণতত্ত্ব)

গুরু বলেছেন, জীবনে কখনো বিশ্বাস হারাবি না। কারণ বিশ্বাসই হলো ঈশ্বরের বিবেক। আমার যা কিছু দেখছি, শুনছি, বলছি, করছি, ভাবছি, যা কিছু হয়েছে, এবং যা কিছু হবে তা সবই ঈশ্বরের বিকাশ। তাই তাঁর উপরও নির্ভর করে, বিশ্বাস রেখেই পথ চলতে হয়। জানবি অপবিত্র ময়লা জলও পবিত্র হয় গঙ্গাজলে পড়লে, গঙ্গাজলে মিশলে, ঠিক তেমনি মলিন মনের মানুষ বাসনাসিক্ত মনের মানুষও পবিত্র হয় নির্মল সাধুসঙ্গ করলে, সৎসঙ্গ করলে। সেই সৎসঙ্গ কেমন জানিস? গঙ্গোত্রী থেকে বয়ে আসা নির্ঝরিনী গঙ্গার পবিত্র নির্মল ধারার মতো। সৎসঙ্গ, সাধুসঙ্গের নিরুচ্চারিত পরশও ঠিক তেমনি। কারণ ওঁদের 'সৎ আত্মা' হলো নদী। 'ধর্ম' তার ঘাট, 'ধৈর্য' হলো তরি, 'দয়া' হলো তরঙ্গ আর 'সত্যের স্রোতই' তার প্রকাশ। তাই সেই সৎসঙ্গ-ধারাতে যারা স্নান করে তারা পবিত্র হয় নির্মল হয়। সমস্ত চাওয়ার শেষ হয়। আর যার চাওয়া গেছে তার চিন্তা গেছে। বস্তুত তাই। ভগবান হলেন দোকানদার। তাঁর অমূল্য ভাণ্ডারে স্থরে স্থরে সাজানো রয়েছে বিবিধ রতন কৃপা, অনুকম্পা, দয়া, আশীর্বাদ আরো আরো কত অমূল্য সম্পদ। তিনি তো দেওয়ার জন্যেই বসে রয়েছেন। ভক্ত হলেন খরিদ্দার। তাঁর পারানীর একমাত্র কড়ি হলো — ভক্তি, শুধুমাত্র ভক্তি, অনন্য ভক্তি। আর শরণাগত হওয়া। সুতরাং ভগবান তো ভক্তের পরীক্ষা নেবেনই। পরীক্ষা নেবেন। দেখবেন। পরখ করবেন তার অনন্য ভক্তির। চোখের জলের। প্রেমাশ্রুর গভীরতা ও তার ব্যাপ্তির। তার জন্যেই তো তিনি তাকে বারবার বিপদে ফেলবেন। সহায়-সম্বলহীন করবেন। চরম বিপদের মুখে ঠেলে দেবেন। সংশয়াতীত ভাবে জীবন সমুদ্রের চোরাস্রোতে খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে দিয়ে দেখবেন তার সহন ক্ষমতা। আর পরমেশ্বর বলেই না তিনি ভক্তাধীন ভগবান। এবং ভগবান বলেই তিনি ভক্তকে শুধু কাঁদানই না ভক্তের কান্নাতে তিনিও কাঁদেন। ভক্ত অভুক্ত থাকলে তিনিও অভূক্ত থাকেন। কারণ জীবমাত্রেই ভগবানের নিত্য দাস। তার ক্ষুৎ পিপাসা সে তো তাঁরই ক্ষুৎ পিপাসা। তাই ক্ষুৎপীড়িত যন্ত্রণাকাতর নিদ্রিত যোগীনকে যেন তিনি ঠেলে জাগিয়ে দিলেন। যেন বলতে চাইছেন —

'ভক্ত সেবা না দিলে ভগবান কি সেবা পায়।
ভক্ত সেবা ভিন্ন ভগবানও উপবাসীই রয়।।'

স্বপ্নাবিষ্ট যোগীন যেন স্পষ্ট শুনলেন — 'ওঠ আমি এখানে ছিলাম, আছি, এবং থাকবো। আমি হলাম — বাবা বৈদ্যনাথ, এটা হলো 'আমার কাছারী বাড়ী'। একদিন এখানে মানুষের ঢল নামবে, দূর দূরান্ত থেকে আমার এই কাছারী বাড়ীতে মানুষ ছুটে আসবে তাদের মনোস্কামনা পূরণের জন্য। মানসিক পূজার জন্য। দিনের পর দিন 'হত্যে দিয়ে' পড়ে থাকবে এখানে। আর কত দিন আমাকে সেবাপূজা না দিয়ে এভাবে অভুক্ত নিরাশ্রয় করে রাখবি?'

'বাবা বৈদ্যনাথ! বাবার কাছারী'

চমকে উঠলেন যোগীন! কি শুনলাম! বাবা তোমার এত দয়া। এত দয়া তোমার? চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ধড়ফড় করে উঠে বসলো যোগীন। না আর দেরী নয় 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'। সকাল হয়ে গিয়েছে। এখনি ছুটতে হবে গ্রামে। লোক-লস্কর নিয়ে নেমে পড়তে হবে 'বাবার কাছারী নির্মাণে'। উন্মাদের মতো ছুটে বেরিয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু মানুষ চাইলেই তো সব হয় না। পায়ও না। তাঁর ইচ্ছাই ইচ্ছা। কারণ —

© Santiniketan Sahityapath

আপন ইচ্ছায় জীব কোটি বাঞ্ছা ধরে।
কৃষ্ণইচ্ছা হইলে তবে ফল ধরে।। (কৃষ্ণতত্ত্ব)

ঠিক তাই। জীব আর ঈশ্বরে শরীর-শরীরী সম্বন্ধ। জীব ঈশ্বরের শরীর বিশেষ। ঈশ্বর শরীরী অর্থাৎ জীবের আত্মা বা অন্তর্যামী স্বরূপ। তাঁর ইচ্ছাতেই জীবের সকল কার্য হয়। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে জীবের কোনো স্বতন্ত্র ইচ্ছাই সম্ভব নয়। অর্থাৎ 'অনুগ্রহ ইচ্ছার' কাছে 'জীবইচ্ছা' নিতান্তই গৌণ, মূল্যহীন। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে হাজারো বাধাবিপত্তি উপস্থিত হলেও তা কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। আর পরম কারুনিক করুণাময় সব সময় উদ্যমী পুরুষদেরই সহায়ক হন। হলোও তাই। একটা মন্দির বা ঠাকুর-থান প্রতিষ্ঠা করতে গেলে তার জন্য ন্যূনতম কিছু জমি চাই। তাছাড়া বাবার সেবাপূজার জন্য ভক্ত-সাধারণের স্নানের জন্য অন্তত একটা ছোটো পুকুরও কাটতে হবে। পৈত্রিক নামীয় যেটুকু জমি এই থান সংলগ্ন বর্তমান, তা তো বাবার কাছারি নির্মাণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাহলে উপায়? যাঁর উপায় তিনিই ভাবেন —

'একান্ত ভাবতে যদি কেউ ভজে সেচরণ।
তাঁর ভাবনা তিনিই ভাবেন তিনি কল্পতরু হন।।
'আমি' যদি আমার না হয়ে 'হয় সবই তাঁর'।
সব দুঃখও যায় তরে তিনি যে করুণাবতার'।।

শিব কাছারি তৈরির উদ্যোগ

করুণাবতারের করুণা কিরণে সেই বাধা ও দূর হলো। বাংলা ১৩৪৯ এন সাল। দামোদর মাস (কার্ত্তিক মাস)। 'শ্রী শ্রী বাবা বৈদ্যনাথের চরণ স্মরণ করে' বাবার উদ্দিষ্ট কাছারি সংলগ্ন জনৈক জমির মালিকের কাছে গিয়ে তাঁর স্বপ্নের কথা, মনোবাসনার কথা সবিনয়ে নিবেদন করলেন গলবস্ত্র ভক্ত-যোগীন। বাবার আশীর্বাদে বাঞ্ছিত ফলই পেলেন তিনি। জমি খরিদ হলো। অতপর শুরু করে দিলেন শ্রী শ্রী বাবা বৈদ্যনাথের মন্দির নির্মাণের কাজ। পুকুর কাটানোর কাজ।

আবার পরীক্ষা। চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন যোগীন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের কালো মেঘ ততদিনে একটু একটু করে থাবা বসাতে শুরু করেছে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে। ঘরে ঘরে উঠতে শুরু করেছে কান্নার রোল। ক্ষুৎ-পিপাসার্ত নিরন্ন মানুষগুলির মুখের দিকে তাকানো দায়, দু'মুঠো, ভাত তো দুরের কথা একটু ফ্যানের জন্য যন্ত্রণাক্লিষ্টা মা তার ক্ষুৎপিপাসায় কাতর নির্জীব কঙ্কালসার শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে লোকের দরজায় দরজায় হত্যে দিয়ে পড়ে থাকছে। পড়ে থাকছে নির্মম নিষ্ঠুর প্রত্যাশার মুখ চেয়ে। ভগবান সব সময় দূরে থেকেই কেবল মুখ টিপে হাসেন না — সশরীরে প্রকট হন জীব সন্নিধানে। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে —

দিব্যোম্মাদ জীবের বন্ধরূপে পরমাত্মা আসি।
উপদ্রষ্টা, অনুমন্ত্রা হন অন্তরেতে বসি।। (১৩/২২)

অর্থাৎ দেহে স্থিত আত্মা বাস্তবে 'পরমাত্মাই'। তিনি যেমন 'ভর্তা হয়ে' সবাইকে ভরণপোষণ করেন। 'অনুমন্ত্রা' অর্থাৎ 'অনুমোদন কারী' হয়ে কর্মের যথার্থ সম্মতি প্রদান করেন। তেমনি 'উপদ্রষ্টা' অর্থাৎ সাক্ষী হয়েও অবস্থান করেন দেহভ্যান্তরে। পরিবর্তন এলো। উদ্ভোধিত হলো নূতন থেকে নূতনতর জীবনে। মন্দির নির্মাণের কাজ। পুকুর কাটার কাজ। তার মধ্যে আবার নূতন দ্বার পরিগ্রহ করলেন তিনি। বিবাহ করলেন নিকটবর্তী বাগদহ গ্রামের বধিষ্ণু হালদার পরিবারের সুলক্ষণা কন্যা 'সুবর্ণময়ী'কে। বিধাতা পুরুষেরও বোধহয় এমনি ইচ্ছা ছিল। তাই আবাল্য সংস্কারে যে মেয়ে 'শিবের মাথায়' জল না দিয়ে কিছু মুখে তুলতো না, 'মহা-শিবচতুর্দ্দশী'তে রাত্রি জাগরণ করতে পিছপা হতো না, সেই মেয়ে কিনা তার সমবয়সী সমস্ত বন্ধুদের বিয়ে হওয়ার পরও তাকে 'অনূঢ়া' হয়ে থাকতে হলো। কথাটা মিথ্যা নয় —

'জন্ম-মৃত্যু বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে'

সুতরাং বিধাতাপুরুষ কার জন্য কি লিখে রেখেছেন তা বোঝে কার সাধ্য।

ততদিনে মন্বন্তরের কালোছায়া অপসৃত হয়েছে। অপসৃত হয়েছে মনের কালো মেঘও। এখন শুধু এগিয়ে যাওয়ার পালা।

© Santiniketan Sahityapath

শিব কাছারি প্রতিষ্ঠা

এল সেই মুহূর্ত। শুভমুহূর্ত। পরম লগন। ১৩৫১ সাল, ২রা বৈশাখ, শনিবার মানুষের ঢল নামলো ওখানে। কুন্দরালী নয় স্থান মাহাত্ম্যে তখন তা শ্রী শ্রী বাবা বৈদ্যনাথ শিব কাছারী'। লোকের কথায় 'বদ্যিনাথ'। সেবায়েত শুধু মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত 'যোগীন' নয় বাবা বৈদ্যনাথের অনুগ্রহও কৃপালাভে ধন্য যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। ইতিহাস-ইতিহাসই। ইতিহাসের হাত ধরে ইতিহাসকে সাক্ষী রেখে যে 'শিবপীঠের' উত্থান হয়েছিল সিদ্ধভক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের জীবদ্দশাতেই তা উল্লেখযোগ্য 'শিবপীঠ' হিসাবে আপামর জনসাধারণের মনের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছিল। তার ধারা আজও প্রবাহমান।

তথ্যসূত্র:

১। 'মুক্তিতীর্থ', পঞ্চানন হালদার, ১৪১৯, মায়া গ্রন্থ নিকেতন
২। 'ওঁ নম শিবায়', প্রশান্তকুমার হালদার, ২০১৩, স্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩। স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের বর্তমান উত্তরসূরিদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য

সহায়ক গ্রন্থ:

১। কমল চৌধুরী, 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ইতিহাস', মডেল পাবলিশিং, ১৯৮৭
২। বরুণকুমার চক্রবর্তী, 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা', অনলাইন বুক স্টোর, সংস্করণ ২০২৩

Prantik Gabeshana Patrika